Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 183 –191
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মধুকুপির পরিবর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দাশু ঘরামি ও মুরলীর সম্পর্কের বিবর্তন : সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'

Evolution of relationship between Dashu Ghorami and Murli in Madhukupi's changing socio- economic context- 'Shotokiya' by Subodh Ghosh

শঙ্খ দত্ত
ইমেইল : jammm8419@gmail.com

Keyword
poverty, collapse of agricultural economy, corruption, new occupations, conversion of religion, weakening of aboriginal society, ambition, maternity.

Abstract
Tempted by the dream of a better, prosperous life, Madhukupi's peasant Dashu Ghorami's pregnant wife Murli leaves her husband, her own society, religion and culture for the sake of her unborn child and establishes a new family with a Christian identity in Haranganj. After losing one and a half Bigha of his land by the conspiracy of a local land owner, pauper Dashu tries his best to buy his own land and dreams of having back his wife again with their son but newly emerged coal mines, soil- cutting factories and rail track implantation sites around Madhukupi start employing the villagers as daily wage workers and therefore Madhukupi's old agricultural economy collapses. Due to the damage of Madhukupi's natural resources, corruption of landlord and administrators and the new government policy of joint farming instead of farmers' individual ownership of land drive more and more farmers out of their old occupation and Madhukupi. Dashu's son does not get accommodation in Murli's new family and ends up in a Christian orphanage. Ambitious murli marries Dr Richard Sarkar but his impotency deprives her of her conjugal demands and her maternity both. Finally, defeated in the battle of life, Dashu comes to see his son at Haranganj and finds no place for him in Murli's life anymore. Then he commits suicide.

Discussion

১

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮) উপন্যাস প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন-

> "ইহাতে মানভূম- অঞ্চলের আদিমসংস্কারপ্রধান জীবনযাত্রার সহিত উহার প্রকৃতিপরিবেশের এক আশ্চর্য অন্তঃসঙ্গতি ও একাত্মতা রূপ পাইয়াছে..." [১]

কিন্তু এই সঙ্গতি বেশিদিন অক্ষুণ্ণ থাকেনি। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়ছে জোতদারদের লাগামছাড়া লোভ ও কৃষকদের উপর শোষণের কারণে, একইসঙ্গে গ্রামের পরিধিতেই গড়ে ওঠা নতুন কলকারখানা ও খনিতে কাজের সুযোগে দলে দলে আদিবাসী তিনপুরুষের পেশা ছেড়ে যোগ দিচ্ছে শ্রমিকের কাজে। সেইসঙ্গে চলে আদিবাসী সমাজের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদ ও খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের প্রলোভন।

> "বহু আদিবাসী নিজ উপজাতীয় সমাজ ছেড়ে দিয়ে হিন্দু বা খৃস্টানরূপে উন্নত হয়েছে, তার ফলে উপজাতীয় সমাজের সংহতি ও শক্তি অনেকখানি অবনত হয়েছে।" [২]

দাশু ঘরামির পাঁচবছরের অনুপস্থিতিতেই এই উপন্যাসের তথা দাশু ও মুরলীর সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কোন পথে যাবে ভবিষ্যতে, তার বীজ রোপণ হয়েছে এবং যিনি স্বহস্তে এই কাজটি করেছেন তিনি হারানগঞ্জের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া সিস্টারদিদি সিস্টার মাদলিন। চার মাসের সাজা মকুব হওয়ার পর জেল থেকে বেরিয়ে মধুকুপিতে ফিরেই দাশুর এতক্ষণের গ্রামে ফেরার সব উৎসাহ যেন প্রবল বিস্ময়ে একটা ধাক্কা খায়- কই মধুকুপিকে তো আর চেনা মনে হচ্ছে না !

তার ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়া লাল, কাঁকর বিছানো ধুলোমাখা পথটা কবে যেন পাকা হয়ে গেছে, মধুকুপির ডাঙার দূর কিনারায় কত ইমারত উঠেছে, ডরানি নদীতে পুল বাঁধা হয়েছে, অনেক দূরে চিমনির মুখ থেকে ধোঁওয়া উঠছে- না, এই মধুকুপিকে দাশুর মনে হয়,

> "না, ঠিক সে মধুকুপি নয়। ... বদলে গিয়েছে মধুকুপি" [৩]

এরপরেই অবধারিত ভাবে দ্বিতীয় আশঙ্কাটি তার মনে আসে-

> "তাহলে কি মুরলীর মুখের হাসিটাও বদলে গিয়েছে?" [৪]

অষ্টাদশী যে মুরলীকে দাশু দেখে গেছিল, ঘরে ফিরে তার সাথে বর্তমানের তেইশের এই মুরলীকে সে যেন আর মেলাতে পারে না। পোশাক আশাকে, ঘরের সাজসজ্জায়, জীবনযাত্রায় আমূল বদলে গেছে মুরলী- সে যেন আর কিষাণ দাশু ঘরামির ঘরণী নয়, এই তরুণী যেন হারানগঞ্জের গির্জাবাড়িতে যাওয়া কোন বাবুসাহেবের ঘরের মেয়ে। গত পাঁচবছরে জেলে ঘুম ভেঙেই মুরলীর যে চেহারাটি মনে পড়ত দাশুর, এ সে নয়। যার 'মরদ' পাঁচ বছর জেল থেকে একটি পয়সাও পাঠাতে পারেনি ঘরে, তার স্ত্রীর এত চাকচিক্য কিভাবে হয়? আমরা বুঝতে পারি মধুকুপি আর মুরলী সমার্থক ছিল দাশুর কাছে। আর আজও পরিবর্তমান মধুকুপির মূর্ত প্রতীক হয়েই যেন মুরলী দাঁড়িয়ে আছে দাশুর সামনে। উভয়েরই যেন কৌমার্য নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মুরলীই নিরসন করে তার এই সন্দেহের।

> "মহেশ রাখালের বেটিরা পরের মর্দানির থুতু গিলে না।" [৫]

আশ্বস্ত হয় দাশু। এ সেই একান্ন টাকা পণে বিয়ে করে আনা ঝালদার মহেশ রাখালের এক মেয়েই বটে যাদের চারিত্রিক খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

মুরলী তার কাছে ব্যাখ্যা করে গত পাঁচ বছরে কীভাবে হারানগঞ্জের সিস্টারদিদি তাকে একটু একটু করে স্বনির্ভর হতে শিখিয়েছে, পোশাকে আশাকে, গৃহসজ্জায় তাকে করে তুলেছে মধুকুপির সকল মেয়ে- বৌদের থেকে আলাদা। কিন্তু শুধু কি তাই? খ্রিস্টান দিদির সান্নিধ্যে এসে কেবলই কি মুরলীর বহিরঙ্গেরই পরিবর্তন হয়েছে? অন্তরে কি সে এখনও মধুকুপির এক 'গাওয়ার' কিষাণের ঘরণীই আছে? আমরা দেখি দাশুর আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে মুরলী স্বীকার করে গত পাঁচ বছরে সিস্টারদিদির নিষেধে সে করমের পরবে নাচেনি, হাঁড়িয়া খায়নি, কপালবাবার থানের বেলপাতার বদলে গোবিন্দপুর হাসপাতালের ওষুধ খেয়েছে একবার, টীকা নিয়েছে, এমনকি তার এই ঘরে বসেই সিস্টারদিদি খ্রিস্টান 'শোলক'ও গেয়েছেন। মুরলী এখন হাঁটু অবধি শাড়ি পরতেও লজ্জা পায়। উপড়ে ফেলেছে সে তার যাবতীয় আদিবাসী সংস্কার। এখন মুরলী চায় হারানঞ্জের স্কুলে লেখাপড়া শিখতে। দাশুর মনে হয় এইজন্যই কি বাবুর বাজারে নিতাই মুদি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল,

> "অসময়ে হঠাৎ ঘরে গিয়ে ঢুকলে ... যাচ্ছিস যা কিন্তু ঠকবি।" [৬]

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, মুরলী তাকে জানায় সিস্টারদিদির কাছে সে শপথ করেছে যতদিন না দাশু খৃস্টান হবে, চাষাবাদের পেশা ছেড়ে কারখানায় কাজ নিয়ে 'ভালোমানুষ' হবে ততদিন মুরলী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করবে না।

"মুরলীর প্রাণটাই মেমসাহেব হয়ে গিয়েছে... একটা আশা খুন হয়ে গিয়েছে।" [৭]

সিস্টার মাদলিনের এহেন নির্দেশের পর আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না স্বামীর অনুপস্থিতিতে মুরলীর দিকে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য নিছক জনসেবা নয় বরং মুরলীকে স্বধর্মচ্যুত করে খৃস্টানধর্মে ধর্মান্তরকরণই প্রধান কারণ। স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' বইতে বলেছিলেন, খৃস্টান মিশনারিরা ভারতে পর্তুগিজ আগমনের পর থেকেই তাদের ধর্মীয় প্রচারাভিযান শুরু করলেও প্রথমদিকে তা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তা বিশেষ পায়নি কিন্তু ১৮১৩ খ্রিঃ চার্টার আইন পাশ হলে তারা পতিত ভারতবাসীর ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রথম রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেল। এখানেও আমরা খেয়াল করি যাবতীয় সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বদলে প্রান্তিক মানুষের 'নৈতিক উন্নতি'র স্বার্থে ধর্মান্তরকরণ ও তাদের লোকাচার ও সংস্কারের প্রতি সিস্টারদিদির অশ্রদ্ধা।

মুরলীর স্বীকারোক্তির পরেই দাশু ও মুরলীর জীবনাদর্শের মধ্যে আমরা তফাত লক্ষ্য করতে শুরু করি। স্ত্রীর প্রতি অভিমানে সে রাতেই ঘর ছেড়ে চলে যেত দাশু যদি না মধুকুপির আতঙ্ক বাঘিনী কানারানী তার পথ রোধ করে দাঁড়াত। অবশেষে আতঙ্কিত মুরলীর অশ্রুস্পর্শে দাশু শান্ত হয়, মুরলীও আর সিস্টারদিদিকে দেওয়া কথা রাখতে পারে না। শেষরাতে সে অনুভব করে সে দাশুর সন্তানকে আজ গর্ভে ধারণ করল। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার আমরা দেখি মুরলী সঙ্কুচিত হয় পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা মনে করে। এভাবে আখ্যানে বারবার দিন ও রাত্রির ব্যবধানে একদিকে দাশুর প্রতি প্রেম আবার অন্যদিকে খ্রিস্টান জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে মুরলীর মনের অবিরাম মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বটি সুবোধ ঘোষ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এই টানাপোড়েন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দাশু তার পাঁচ বছরের থেমে থাকা সংসারের চাকাটা সচল করতে নানারকম পরিকল্পনা করে। কখনও ভাবে গোরুর গাড়ি চালাবে, কখনও ভাবে মাঠান কুলের জঙ্গলে লা-পোকার ডাঁটি ভেঙে উপার্জন করবে, নয়ত জোতদার ঈশান মোক্তারের কাছ থেকে বিঘা তিনেক জমি সে চিঠা বা কোর্ফা নেবে। কিন্তু কিছুতেই তার তৃপ্তি হয়না। অবশেষে সে স্বপ্ন দেখে গুলঞ্চের বেড়া দেওয়া এক খন্ড নিজস্ব জমির যেখানে সে জিরে, সরগুজা ফলাবে। আলোচ্য উপন্যাসে দাশু পাঠকের সহানুভূতি পেলেও আমরা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারি মুরলীর বাস্তববোধের সামনে কপর্দকহীন দাশুর নিজের জমির এই সাধ ও স্বপ্ন নেহাতই ভাবালুতা মাত্র। তাই যেদিনই মুরলী তার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয় সেদিন থেকেই সে সব টানাপোড়েন দূরে সরিয়ে হারানগঞ্জের স্বচ্ছল জীবনকেই কামনা করতে শুরু করে। সে তার সন্তানকে অনাহারে রাখতে রাজি নয়।

> "সুখচরের জনৈক রামকমল মজুমদার 'সংবাদ প্রভাকর'- এ একটি পত্রে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের তিনটি কৌশলের কথা বলেনঃ (ক) হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও দেবদেবীর কুৎসামূলক পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ; (খ) বাঙালিদের ঘরের সামনে কিম্বা প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজধর্মের গৌরব ও পরধর্মের জঘন্যতা ঘোষণা; (গ) লোভে পড়ে কিম্বা অন্য কোনো কারণে কেউ খ্রিস্টান হলে তাকে যত্নপূর্বক প্রতিপালন ও কর্মে নিযুক্তকরণ- যাতে অন্যরা তাদের পথ অনুসরণ করতে উৎসাহ পায়... নিম্নবর্ণের লোক, জাতিচ্যুত ও নিতান্ত দরিদ্ররাই খ্রিস্টান হত, এর পেছনে লোভের হাতছানিটাই ছিল বড়।" [৮]

মুরলীর ক্ষেত্রে প্রধানত শেষ কৌশলটাই ব্যবহার করেছিলেন সিস্টার মাদলিন। তিনি মুরলীর মনে আজন্মলালিত আদিম সংস্কার সম্পর্কে অনাস্থা সৃষ্টি করেন এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুরলীর মন থেকে মধুকুপির কিষাণ ঘরণী হবার সাধ একেবারেই ঘুচিয়ে দেন।

পাঁচ বছরের হাজতবাসে দাশু এখনও খবর পায়নি মধুকুপি গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি কতটা বদলে গেছে। এখনও দাশু তার চিরচেনা মধুকুপির আকাশের দিকে তাকিয়ে সান্তনা খোঁজে কিন্তু জানতে পারে না বড়কালুর পশ্চিমে বিশাল শালবন উপড়ে সেখানে প্রকাণ্ড কয়লাখনির খাদ সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি হয়েছে আরও তিনটে নতুন খনি। মধুকুপির পুরনো মনিষ সুরেন মানঝি এখন সেখানে মালকাটা। পূর্বদিকের ইমারতগুলো সেন অ্যান্ড ওয়াল্টার কোম্পানির বিভিন্ন ল্যাবরেটরি, মাটিচালান কোম্পানির বিভিন্ন অফিস, বাবু ও কুলিদের কোয়ার্টার। মধুকুপির পুরোনো পালকিবাহক হরিশ, নিধিরাম এবং নটবর সেই খনিতে কাজ করে। ছোটকালুর পেছনদিকে নতুন রেললাইন বসছে, সেখানে ওয়াগন 'লোডিং

আনলোডিং' এর কাজ করে হরিপদ- সে আর জঙ্গলে মৌচাক ভাঙে না। এভাবে মধুকুপির ভূমিপুত্রদের নিত্যনতুন পেশায় আবিষ্কার করে দাশু, আগে যারা অন্যের জমিতে মনিষ খাটত, ঘর ছাইত, মাটি কাটত- তারা আজ আর মধুকুপির অরণ্য ও মাটির উপর নির্ভরশীল নয়। দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয় সে, কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না নতুনের সঙ্গে। একদিকে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন অন্যদিকে মুরলীর উপর সিস্টারদিদির প্রভাবে ক্রমশ কোণঠাসা হয় সে, বারবার মুরলী তাকে জোর করে সিস্টার দিদির প্রস্তাব মেনে নিতে, আগত অনাহারেরও ভয় দেখায় কিন্তু ততই মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কিছুতেই সে ছাড়বে না 'মধুকুপির কিষাণ' পরিচয়। মুরলীর চোখে খৃস্টান শিকারী পলুস হালদারের জন্য মুগ্ধতা দেখে প্রবল ঈর্ষায় সে আরোও পরিশ্রমী হয়ে ওঠে। সে জানে সংসারে অনাহার এলেই মুরলী অজুহাত খুঁজে পাবে তাকে ত্যাগ করার তাই জমির ব্যবস্থা করতে না পেরে সে কানারানীর ভয় উপেক্ষা করে কপালবাবার জঙ্গলে ঢুকে শিসালের আঁশ সংগ্রহ করে বা কাঠকয়লা কুড়িয়ে রোজগার করে, তবু সে মুরলীর জেদের কাছে হারবে না। মুরলী তাকে জানিয়ে দিয়েছে সে দাশুর ঘরকে ঘৃণা করে, সে আজীবন কিষাণের কামিন হয়ে থাকতে পারবে না তবু অপেক্ষা করে দাশুর পরাজয়ের। অবশেষে সেই দিন উপস্থিত হয়। ডরানির হড়পা বানে তলিয়ে যায় জঙ্গল। বহু চেষ্টা করেও এক থোকা ডুমুরের বেশি কিছু জোগাড় করতে পারে না সে। প্রাণপণ লড়েও নিয়তির কাছে পরাজিত দাশু। সন্তানের দোহাই দিয়ে আজ তাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত মুরলী এবং শুধু 'ছেইলা'র মুখ দেখার আশাতেই গোঁয়ার কিষাণ হাতে টাঙি তুলে নিতে পারে না। মনে পড়ে কপালবাবার জঙ্গলে ডাকাত গুপী লোহারের বলা কথাগুলো,

> "ছেইলা হলো মায়ের ছেইলা, বাপের নয়।... যে মরদে মাগ আর ছেইলাকে আপন ভাবে, গাঁ আর ঘরকে আপন ভাবে, তারাই নেশা করে বোকা হয়ে আছে।" [৯]

মুরলী পলুস হালদারের সঙ্গে চলে যাওয়ার পরও কিন্তু দাশু পুরোপুরি ভেঙে পড়ে না। তার এখনো মনে হয় গুলঞ্চের বেড়া দেওয়া জমির স্বপ্নটা যদি সফল করতে পারা যায়, যদি তাতে রক্ত জল করা পরিশ্রম করেও সে ফসল ফলাতে পারে তবে মুরলী নিশ্চয়ই একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। আর তাই সে বাকি কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ঈশান মোক্তারের গোমস্তা দুখন গুরুর কাছে দাবী জানায় বাইরে থেকে মনিষ এনে মধুকুপির জমি চাষ করা যাবে না। গ্রামের কৃষকদের মধ্যেই সব ভালো জমি বিনা নজরানাতেই ভাগজোত করে দিতে হবে কুঠি বীজ লাঙল সমেত। কিন্তু দাশুর কোনো পরিকল্পনাই কাজ করে না। বিদ্রোহী কৃষকদের বাদ দিয়েই গ্রামের অনুগত কৃষকদের নিয়েই জমিতে মনিষ খাটার কাজ ভাগ করে দেয় দুখন গুরু। শুধু তাই নয়, মধুকুপির লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আদিম রীতিসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে দুখন গুরুজির হাত ধরে গ্রামে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণ্যবাদ। জাত ভাগ হয় জাতিয়া, খাদিয়া ও কুঁকড়াশীতে। মেয়েদের পরবে করম নাচের অধিকার চলে যায়, মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে করা হয় দশ, বনচণ্ডীর পুজো করাও নিষিদ্ধ হয়। দাশুর মত যারা নিজের আদিম রীতিনীতি বিসর্জন দিতে রাজি হলো না তাদের স্থান হল সমাজে সবথেকে নিচুতে- কুঁকরাশী হিসেবে। এভাবেই দাশুর চোখের সামনেই বদলে গেল মধুকুপি গ্রাম। যে জমি ছিল কিষাণের বুকের বল, সেই জমির অভাবে একদিকে খনিতে কাজের টোপ অন্যদিকে খৃস্টান ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সাঁড়াশী আক্রমণে ছারখার হয়ে গেলো মধুকুপির জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার অন্তর্কাঠামোটি।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, সুবোধ ঘোষ তাঁর একাধিক উপন্যাসে বিভিন্ন প্রাণীকে উপমা ও রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। 'শতকিয়া'ও তার ব্যাতিক্রম নয়। বাঘিনী কানারানী এই উপন্যাসে কখনো হয়ে উঠেছে দাশুর বিবেকের রূপক কখনো বা তার আত্মস্বরূপ বা alter ego। জেল থেকে ফিরে মুরলীর নতুন রূপ দেখে প্রস্থানোদ্যোত দাশুর পথ আটকায় কানারানী। মুরলীর পরনের শাড়িটাকে সে দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে। সেদিনই শেষরাতে ঈশান মোক্তারের গোরুগুলোকেও সে জখম করে। কানারানী গ্রামের তিন কলঙ্কিনী পল্টনী দিদি, তেতরি ঘাসিন ও ফুলকি মাসিকেও ভয় দেখায়। তেতরি ঘাসিনের অভিসারের পোশাক লাল সায়াটিকেও একইভাবে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে কানারানী। আমরা বুঝতে পারি দাশুর চোখে যা যা অবৈধ বা অন্যায় সেগুলোকেই বেছে বেছে আক্রমণ করে কানারানী। সিস্টারদিদিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে মুরলী দাশুর অঙ্কশায়িনী হলে দূর থেকে কানারানীর গর্জন ভেসে আসে। সেই গর্জনের অর্থও কেবল দাশুই বুঝতে পারে-

> "খুব খুশি কানারানী... তোর আমার নতুন বিয়া দিতে কানারানী এসেছিল।" [১০]

গোটা গাঁয়ের লোক তাকে ভয় পেলেও একমাত্র দাশুর কাছেই সে হয়ে ওঠে বনমাতা। কপালবাবার জঙ্গলে শিসালের আঁশ সংগ্রহে গেলে দাশুকে কানারানী ভালুকের আক্রমণ থেকে বাঁচায়- যেন সেও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে দাশু ও মুরলীর সম্পর্কটি টিঁকিয়ে রাখার। দাশুকে ত্যাগ করে যাবার সময়ও কানারানী মহেশ রাখালকে আহত করে, গোরুর গাড়ির গোরুটিকে মেরে তাকে আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু মুরলীর গায়ে নখস্পর্শও করে না কারণ তার গর্ভে তখন দাশুর সন্তান। তাই পলুস হালদারের গুলিতে কানারানীর মৃত্যু হলে তা যেন দাশুর পরাজয়কেই সূচিত করে।

অন্যদিকে পল্টনী দিদি, তেতরি ঘাসিন বা ফুলকি মাসি আজ গ্রামের কলঙ্ক হলেও তারা সকলেই নিরুপায় হয়েই অন্নাভাবে এই পথ বেছে নিয়েছে। কারুর গোটা পরিবার শেষ হয়ে গেছে কলেরায়, কারুর স্বামী মারা গেছে অপঘাতে আবার কারুর বা স্বামী পঙ্গু। কিন্তু মুরলী যখন সব থেকেও দাশুর অনুপস্থিতিতে পলুসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে তখন একে একে তিনজনই এসে তাকে তিরস্কার করে যায়। ফলে আজ যখন দাশু দেখে অনাহারের জ্বালায় এদের কেউ তার সন্তানদের স্বেচ্ছায় হারানগঞ্জের অনাথবাড়িতে পাঠাচ্ছে, আবার কেউ বা বাধ্য হয়েই কয়লাখনিতে কাজ পাবার আশায় গাঁ ছেড়ে যাচ্ছে তখন তা সার্বিকভাবে মধুকুপির নিজস্বতাকে, তার আত্মনির্ভরতাকেই যেন ব্যঙ্গ করে, নিয়তি যেন মুরলীর কাছে দাশুকে হারিয়ে দেয়। তাই এরপরে যখন ঈশান মোক্তার ও দুখন গুরুর ষড়যন্ত্রে পুলিশ আবার নানা অভিযোগে দাশুকে গ্রেফতার করে তখন দাশু যেন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পায় না।

২

ফাদার হার্ন প্রতিষ্ঠিত হার্নগঞ্জ বা হারানগঞ্জে শুরু হল মুরলীর দ্বিতীয় জীবন। নিখুঁত পরিকল্পনা ও বুদ্ধির জোরে সে মুন্সী চৌধুরী ও রামাইকে ফাঁকি দিয়ে এমনকি তার বাবা ঝালদার মহেশ রাখালকে অবধি ফাঁকি দিয়ে পৌঁছে গেল তার স্বপ্নের ঠিকানায়। সিস্টার দিদি মুরলীকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তার নতুন নামকরণ করলেন জোহানা। এ যেন মুরলীর নবজন্ম। পলুসের গৃহিণীরূপে সে পা দিল পলুসের ঝকঝকে সাজানো নতুন বাড়িতে। অবশেষে মুরলী বাঁচাতে পেরেছে তার গর্ভস্থ সন্তানকে মধুকুপীর কিষাণের অনাহারের সংসার থেকে। কিন্তু সেদিন রাতেই মুরলীর সমস্ত স্বপ্ন যেন চুরমার হয়ে যায় পলুসের একটি কথায় -

"তা হয়না জোহানা। কোন পাগলেরও পরের ছেইলার বাপ হতে সাধ হয়না।" [১১]

ব্যথিত, দিশেহারা মুরলী পলুসকে কোনোভাবেই রাজি করাতে না পেরে অবশেষে সিস্টার দিদির শরণাপন্ন হয় কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়। সিস্টার মাদলিন সংস্কারহীন অখ্রিস্টান কিষানের সন্তানকে খ্রিস্টান পলুসের সন্তান হিসেবে মেনে নেবেন না। এমনকি মুরলীর কাতর অনুরোধেও তিনি মুরলীর সন্তানকে জন্মের পর মধুকুপীতে দাশুর কাছে ফেরত পাঠাতে রাজি হন না। মুরলীর সন্তান মুরলীরই অদূরে অনাথবাড়িতে অনাথের মতই বড় হবে এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করার পরেই আমরা দেখতে পাই পলুসের প্রতি এক অদ্ভুত নিস্পৃহতা ও শীতলতা মুরলীকে ঘিরে ধরে। সারা দিন পরে ক্লান্ত হয়ে একটা গোটা মাসের মাইনে খরচ করে মুরলীকে খুশি করার জন্য উপহার আনলেও আমরা মুরলীর প্রতিক্রিয়ায় প্রেমের বদলে আরো পাওয়ার লোভ ও অতৃপ্তিই লক্ষ্য করি। পলুসের চোখে নয়, আয়নায় সে নিজের রূপের মোহেই মোহগ্রস্ত হতে চায়।

"আস্তে আস্তে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে পলুস- চিজটার দাম নিল আশি টাকা দশ আনা।" [১২]

মুরলী উত্তর দেয়-

"আরও দুটা দানা হলে ভাল হত পলুস।" [১৩]

উপন্যাসের এই অংশেও আমরা মুরলীর মাতৃত্বকে তার ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দের উর্ধে স্থান দিতে পারি কারণ পলুস তার মন পেতে যখন তার সন্তানকে কাছে রাখার অনুমতি দেয়, মুরলীর সমস্ত নিস্পৃহতা মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। প্রথম দিনের শারীরিক মিলন সন্তানের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবেই মুরলীকে তৃপ্তি দেয়নি কিন্তু আজ সে সব বেদনা ভুলে গিয়ে তৃপ্তি ও শান্তি খুঁজে পায় পলুসের কাছেই।

"হ্যাঁ পলুস, এ ঘর আমার মরদের ঘর বটে। আমার ছেইলার বাপ বটে তুমি।" [১৪]

চূড়ান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও মুরলীর এই স্বীকারোক্ত থেকে পলুস বুঝতে পারে মুরলীর প্রেম পলুসের প্রতি নয়, মুরলীর সন্তানের পিতার প্রতি। মুরলী তার সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে পলুসকে ব্যবহার করছে মাত্র।

> "তুমি তোমার ছেইলার বাপের কাছ থেকে সুখ নিতে চাও, আমার থেকে নিতে চাও না। তুমি তোমার ছেইলার বাপকে সুখ দিতে চাও, আমাকে দিতে চাও না।" [১৫]

সুবোধ ঘোষ এই অংশে একটি স্বপ্ন দৃশ্য যোগ করেছেন যেখানে দুজনেরই অবচেতন মন তাদের অতীত জীবনের প্রেম ও দাম্পত্যসুখকে ত্যাগ করে আসার হতাশা ব্যক্ত করে ফেলে অপরের কাছে এবং দুজনেই তাদের বর্তমান সম্পর্কের স্বরূপ বুঝতে পারে। পৌরুষের অপমানে ক্রুদ্ধ পলুস ফিরিয়ে নেয় তার প্রস্তাব এবং এরপর থেকেই দুজনের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে বাড়তে সীমাহীন হয়ে ওঠে। এখানেও আমরা খুঁজে পাই মধুকুপীর সেই মুরলীকে যে সোচ্চারে প্রতিবাদ করে না, নীরবে শাসন মেনে নেয় কিন্তু তার এই নীরবতাই শতগুণে বাঙ্ময় হয়ে উঠে তাদের প্রেমের মৃত্যুকেই ঘোষণা করে। পলুসের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে রিচার্ড সরকারের দেখা ও পরিচয় পেয়ে সাময়িক ঘোরের মধ্যে চলে গেছিল মুরলী- এবার তাকে কেন্দ্র করেই তার দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। পলুস আপ্রাণ চেষ্টা করে মুরলীর মন পাওয়ার, সাধ্যের অতীত ব্যয় করেও মুরলীকে খুশি করতে চায় কিন্তু মুরলীর শীতলতা কিছুমাত্র কমে না বরং দিনদিন আরো দূরে সরে যায় মুরলী। পলুসের প্রতিটি প্রেমের উপহারকেই সে দাম দিয়ে বিচার করে, বিদ্রূপ করে তার আর্থিক ক্ষমতাকে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে তার চাহিদা- পলুস হালদার নয়, রিচার্ড সরকারের মনের মত হয়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন নিজেকে তেমন ভাবে গড়ে নিতে শুরু করে মুরলী। সে লিপস্টিক মেখে সাজে কিন্তু পলুসকে দেখানোর আগ্রহ তার নেই, চিঠি লেখা শেখে কিন্তু পলুসকে লেখার জন্য নয়। দাশুর গৃহিণী থাকতেই সে লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল বাজনার সঙ্গে ধর্মের গান গাওয়ার শিক্ষাও। মুরলীর পুরো পরিকল্পনাটাই পলুস অনুমান করতে পারে এবং দিনদিন দে ভয়ে হাঁপিয়ে ওঠে অথচ এর থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় খুঁজে পায় না। সিস্টার দিদি থেকে মেরিয়া- প্রত্যেককে নিজের উন্নতি ও অধ্যাবসায়ে মুগ্ধ করে রেখেছে মুরলী, তাছাড়া পলুসের সংসারের প্রতিটি কর্তব্যও সে পালন করে- অবিকল দাশুর ঘরের মতই। শুধু এই মুরলীকে নিষ্প্রাণ মনে হয় পলুসের। প্রাণ যেন তার অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে। তাই সে অভিযোগ করারও সুযোগ পায় না। শাসনে, আদরেও যখন মুরলীকে আয়ত্তে আনতে পারল না পলুস তখন সে তাকে চরম আঘাত করার জন্যই জোর করে অনাথবাড়ির হাসপাতালে ভর্তি করে তার গর্ভস্থ সন্তানকে মুরলীর নাড়ি থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে তার মনোবল ভেঙে দেওয়ার অভিপ্রায়ে কিন্তু এভাবে অজান্তেই সে নিজের দাম্পত্যের শেষকেই যেন তরান্বিত করে। অনাথবাড়িতে ডাঃ রিচার্ড সরকারের সান্নিধ্যে এসেই মুরলী দ্রুত বিজু বাঈয়ের সহায়তায় পলুসকে বদলি করে দেয়। এই উপন্যাসে মুরলীর জটিল মনস্তত্ত্বকে নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সুবোধ ঘোষ। পলুসের প্রতি মুরলীর মনোভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার এই ভাবনায়-

> "মুরলীর ছেইলাকে অনাথবাড়ির অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় যে, তাকে ছেইলা দিবার জন্য এই শরীরটা ছেড়ে দিবার আগে বিষ খেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।" [১৬]

আবার হিসাব করে মুরলী, রিচার্ড সরকারের যোগ্য হয়ে উঠতে এখনও কত সময় লাগবে। ততদিন তার আশ্রয় ও অর্থ প্রয়োজন এবং সেটা দিতে পারে পলুসই।

> "এখনও দরকার আছে, তাই পলুসের ঘরটা চাই, পলুসের টাকাও চাই; কিন্তু পলুসকে চাই না।" [১৭]

কিন্তু এখানেও তার পরিকল্পনার কোনও ত্রুটি রাখে না মুরলী। হাসপাতালে কোলিয়ারির খাজাঞ্চির রক্ষিতা বিজু বাঈকে অনুরোধ করে পলুসের বদলি করে দেয় সুদূর মৌপুর সিমেন্ট কারখানায়।

সন্তান জন্মের পরেই তাকে ত্যাগ করতে হবে জেনেও মনকে শক্ত করতে পারে না মুরলী। এমনকি সে সন্তানকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে গভীর রাতে পালানো মনস্থ করে- তার স্বচ্ছল খ্রিস্টান জীবন, পলুসের দেওয়া সোনার উপহার, সভ্য জগতের পোশাক, সুখাদ্য এবং রিচার্ড সরকারকেও সে ত্যাগ করতে পারে সন্তানকে নিজের কাছে রাখার জন্য। তার আবার মনে হয় দাশুর কথা, মধুকুপির সেই ঘরটায় ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু কখন রাত ফুরিয়ে ভোর হয়ে যায়, তার আর পালানো হয় না।

সন্তানকে বিসর্জন দেবার পরে মুরলীর মনে সামান্যতম টানও আর থাকে না পলুসের প্রতি। এখন সে পুরোপুরি মন দেয় রিচার্ড সরকারের আকাঙ্ক্ষার যোগ্য হয়ে ওঠায়। তার স্ত্রী স্টিফানা মাধবী সরকারের ছবি দেখেছে সে। অবিকল সেইরকম সাদা শাড়িতে সেজে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মুরলী। স্যামুয়েল শশিনাথ রায়ের দুই মেয়ে লিলি আরে মলির কাছ থেকে শহুরে সাজানো গুছোনো কথা বলার কৌশল রপ্ত করেছে সে, শিখে নিয়েছে রিচার্ডের মৃতা পত্নীর গাওয়া মঙ্গল গান। অবশেষে মুরলীর দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা সফল হয়। হারানগঞ্জের শ্রেষ্ঠ সুদর্শন মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। রূপ, বুদ্ধি ও অদম্য অধ্যাবসায়ের সাহায্যে ঝালদার মহেশ রাখালের মেয়ে সামান্যা মুরলী আজ হয়ে উঠেছে ডাঃ রিচার্ড সরকারের সহধর্মিনী। অবশেষে হারানগঞ্জের উচ্চবিত্ত সমাজে তার স্থান হল মিসেস সরকার নামে।

> "মুরলীর ভাগ্যটা এতদিনে যত দীনতা হীনতার ছোঁয়া আর বাঘডাকা রাত্রির ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এক ফুলবাড়ির শুভরাত্রির কোলে পৌঁছে গিয়েছে।" [১৮]

কিন্তু তার এতদিনের পরিকল্পনায়, হিসেব নিকেশে যে সামান্য ত্রুটি রয়ে গেছিল সেটা এতদিন সম্ভবত নিয়তি ছাড়া কেউই টের পায়নি। বিয়ের রাত্রেই মুরলী জানতে পারে রিচার্ড সরকার তাকে মাতৃত্বের স্বাদ কিংবা দাম্পত্য সুখ দিতে অক্ষম। ডাঃ সরকারকে বিয়ে করে খ্রিস্টান উচ্চবিত্ত সমাজে স্থান পাওয়ার ইচ্ছে তার পূরণ হলেও এই সাধ পূরণ করার সাধ্য সে সমাজের নেই, যে স্বাদ তাকে দিয়েছিল সেই গোঁয়ার কিষাণ যার পিতৃত্বকে, সঙ্গ ও প্রেমকে মুরলী মূল্য দেয়নি। কিন্তু সেই ভুলের আর সংশোধন করার উপায় নেই তার, কারণ

> "এই নাম আর এই পরিচয়ের গৌরব থেকে পালিয়ে যাবার আর উপায় নেই।" [১৯]

৩

তিন বছরের সাজা শেষ করে মধুকুপি ফেরে দাশু, মনে এখনও তার গুলঞ্চের বেড়া দেওয়া নিজের এক টুকরো নিজের জমি আর 'ছেইলা' কোলে মুরলীকে ফিরে পাবার স্বপ্ন। কিন্তু এবার যেন নিজের গ্রামকে আরওই চিনতে পারে না সে। মধুকুপির পরিধির বাইরে অর্থনৈতিক উন্নতির চিহ্ন সর্বত্র, দিনকাল বদলে যাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আগের বাবুর বাজার আর নেই। নিতাই মুদির ব্যবসার গায়েও লেগেছে পুঁজির ছোঁওয়া। সে এখন প্রাণতোষ রেস্টুরেন্ট চালায়। আগের মত চিঁড়ে, গুড় আর সে রাখে না দোকানে, বদলে এসেছে পাঁউরুটি আর ডিম। কিন্তু দাশু অবাক হয়ে লক্ষ্য করে বাইরের সমৃদ্ধির ছিঁটেফোঁটাও মধুকুপি পায়নি। এই গ্রাম যেন পরিণত হয়েছে আগের মধুকুপির কঙ্কালে। কেবল মাত্র ঈশান মোক্তার এবং দুখন গুরুজি ছাড়া গোটা মধুকুপি মৃতপ্রায়। ডরানি নদীতে আর জল নেই, বাঁধ দিয়ে সবটুকু জল শুষে নিচ্ছে মাটি কাটা কোম্পানির কারখানা। সবুজ ধানের উপর মাজরা পোকা উড়ছে, বাকি কৃষকদের ধানী জমিগুলো হলুদ হয়ে গেছে, ধানের চিহ্নমাত্র নেই। কপালবাবার জঙ্গলেরও যেন সবুজ ভাব কমে এসেছে। কৃষকদের বাড়িগুলো যেন ধ্বংসস্তুপ। ওদিকে সুরেন মানঝিদের খনির কাজ ফুরিয়েছে, সঞ্চয় সব শেষ, কিন্তু আর কেউ ফিরে আসে না চাষ করতে। সনাতন সপরিবারে গেছে জামুনডাঙায় খাটতে তবু চাষ করে আর সে ভাগ্য ফেরানোর আশা করে না দাশুর মত। মধুকুপির জমি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রবেশ করেছে ট্রাক্টরের মত যন্ত্র, বহু মানুষের কাজ কেড়ে নিয়েছে তারা। দাশু, বাবুর বাজারে দেখে এসেছে ভোটের প্রচার, নিতাইয়ের কাছে শুনে এসেছে এখন নাকি সব জমি হবে কৃষকদের। আবার সে মুরলীকে ফেরত পাওয়ার স্বপ্নটাকে সফল করার জন্য উঠে পড়ে লাগে, ঘুরে ঘুরে সব পুরনো কৃষকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করে জমি পাবার কথা বলে কিন্তু কেউ তেমন সাড়া দেয় না। মধুকুপির কৃষকরা যেন অনাহারের সঙ্গে লড়তে লড়তে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাদের সমাজ ভেঙে গেছে, আবহমান কাল ধরে চলে আসা জাতের নিয়ম মানলে আজ তাদের সমাজ থেকে পতিত হতে হচ্ছে, বাইরের পুঁজি এসে তাদের চাষের জলটুকুও কেড়ে নিয়েছে- এমতাবস্থায় তারা আর নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস করে না। ইতিমধ্যেই জমি জরিপের লোক এসে জানায় সরকার হয়ত জমি দেবে কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা কাউকেই দেবে না। সবাইকে এক জমিতে 'মিলতি জোত' করতে হবে। এ কথায় দাশুর মনে যে অলীক সাধটুকু ছিল মুরলীকে ফেরত পাওয়ার সেটুকুও শেষ হয়ে যায়।

> "আপন জমি হবে না। গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে আপন জমির অহংকার ঘিরে দেওয়া যাবে না। ....না, তুই আসিস না মুরলী।" [২০]

এখানেই শেষ নয়। মাটি কোপানোর কাজ করার সময়ই দুখন গুরু তাকে জানায় মুরলী ও রিচার্ড সরকারের বিয়ের কথা। তার মনে হয় মিথ্যেই সে এতদিন প্রতীক্ষা করেছে মুরলীকে ফেরত পাবার। মুরলীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো থেমে থাকেনি। সে পৌঁছে গেছে দাশুর ধরা ছোঁওয়ারও বাইরে। কিন্তু দাশুর দুর্ভাগ্যের যেন সীমা নেই। জীবনযুদ্ধ ও প্রেম- দুয়েই অসফল হবার পর দাশু এবার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়।

> "দাশু তার শরীর মনের সচলতা এবং সজীবতা, যাকে পরিভাষায় প্রগতিশীলতা বলা যায়- তা গ্রহণ করতে পারেনি বলেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। এই সংকেত দাশুর জীবনদৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে ফেলে।" [২১]

তবু দাশুর জন্য অপেক্ষা করেছিল সকালী, তার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শরীরটাকে ঘৃণা না করেই তার ঘরণী হতে চেয়েছিল সে, তাকে দিতে চেয়েছিল সন্তান। কিন্তু অনুতপ্ত পলুস হালদার মুরলীকে হারিয়ে সকালীর প্রেমের প্রত্যাশায় ফিরে আসে তার জীবনে। ফের নিঃসঙ্গ হয়ে যায় দাশু।

ডরানির জলে ঝাঁপ দিয়ে শরীর ও মনের জ্বালা চিরতরে জুড়োনোর আগে সে নিজের সন্তানকে দেখতে যায় হারানগঞ্জে। কিন্তু সেখানে সে আবিষ্কার করে মুরলী যে অনাগত সন্তানের কথা ভেবে তাকে ত্যাগ করে গেল, শুধু সন্তানের কথা ভেবে যে মুরলীর দিকে দাশু টাঙি তুলে ধরল না, আজ সেই সন্তান মা, বাবা বেঁচে থাকতেও বড় হচ্ছে অনাথবাড়িতে এবং অদৃষ্টের পরিহাসে এই রোগজর্জর শরীর নিয়ে দাশু তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। সিস্টার দিদি তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তার রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কিন্তু শর্ত একটাই- তাকে ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে হবে। কৃতজ্ঞ দাশু রাজি হতে গিয়েও হতে পারে না। সব হারিয়ে আজ দাশুর সর্বস্ব বলতে কেবল নিজের পরিচয়টুকুই আছে, স্ত্রী- সন্তান তো আগেই কেড়ে নিয়েছেন তিনি, বাকিটুকুও যেন কেড়ে নিতে চান সিস্টার দিদি। দাশুর মনে হয় বড্ড হিসাব করে দয়া করেন এই সিস্টার দিদি। 'হিসাব' শব্দটি সচেতন ভাবেই এই উপন্যাসে বারবার বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন সুবোধ ঘোষ। আজীবন দাশু এই হিসাব বুঝতেই চেষ্টা করে গেল। মুরলীর হিসাব, সিস্টার দিদির হিসাব, কপালবাবার হিসাব,- কিন্তু খেই মেলাতে পারল না। শুধু সকালীকে দেখেই তার মনে হয়েছিল সে যেন মুরলীর ঠিক বিপরীত- সে মায়া জানে, হিসাব অত বোঝে না। কিন্তু এটুকু বুঝেছে দাশু, মাত্র ত্রিশ বছর বয়েসেই অনেক আশা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, অসুখ, অত্যাচার, চোখের জল, ভাগ্যের মার সহ্য করে তার জীবনের হিসাব এক, দুই, তিন করে শতকিয়ায় পৌঁছে গেছে। তবু সে মুরলীর ডাকে পিছন ফেরে, এখনও তার আশা মরেও মরে না। এখনও যদি মুরলী বলে তাকে হারানগঞ্জে থেকে যেতে সে চেষ্টা করবে নতুন করে বাঁচার। কিন্তু মুরলী নিজেই তাকে এই মোহ থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসে। সে অনুভব করে সিস্টার দিদি বহু আগেই তার স্ত্রী-পুত্রকে দাশুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তার অন্তরটিকে মেরে ফেলেছে। আজ কেবল অবশিষ্ট আছে তার এই রোগজীর্ণ, নিষ্প্রাণ কাঠামোটি। তাই দীর্ঘদিন পরে দাশুর কাছে এগিয়ে আসে মুরলী এবং তাকে পরামর্শ দেয়-

> "তোমার মরণ ভাল। " [২২]

এবার দাশুর সব সংশয় দূর হয়। তার আর কোনও প্রাপ্য কোথাও অবশিষ্ট নেই। সে নিশ্চিন্তে ডরানির প্রবল জলোচ্ছাসের মধ্যে নিজের ভাগ্যবিড়ম্বিত ভগ্ন কাঠামোটির বিসর্জন দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, পৃ. ৩৫৮
২. ঘোষ, সুবোধ, 'উপজাতীয়-সমাজ-সংহতি', 'সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র ৪', কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৪৩১
৩. ঘোষ, সুবোধ, 'শতকিয়া', 'সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র ৩', কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ১২৪

৪. ঐ
৫. তদেব, পৃ. ১৩১
৬. তদেব, পৃ. ১২১
৭. তদেব, পৃ. ১৩৩
৮. স্বপন বসুঃ 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস ১৮২৬-১৮৫৬', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৬৪
৯ ঘোষ, সুবোধ, 'শতকিয়া', 'সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র ৩', কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ১৭৫
১০. তদেব, পৃ. ১৩৭
১১. তদেব, পৃ. ২৭৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮৯
১৩. ঐ
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৯৫
১৬. তদেব, পৃ. ৩১৩ - ৩১৪
১৭. তদেব, পৃ. ৩১৪
১৮. তদেব, পৃ. ৩৭২
১৯. তদেব, পৃ. ৩৭৫
২০. তদেব, পৃ. ৩৬৮
২১. অরিন্দম গোস্বামী, সুবোধ ঘোষ, কথাসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০০১, পৃ. ২০৩
২২. সুবোধ ঘোষ, 'শতকিয়া', 'সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র ৩', কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৪০৬